بسم الله الرحمن الرحيم

সাইকোলজি

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

সাইকোলজি

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

মূল

ড. আইশা হামদান

অনুবাদ

সিফাত-ঈ-মুহাম্মদ

সম্পাদনা

ডা. শামসুল আরেফীন

سيرة

সীরাত পাবলিকেশন

সাইকোলজি: ইসলামি দৃষ্টিকোণ

গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা, ২০২০

ISBN: 978-984-8041-88-8

প্রকাশক
সীরাত পাবলিকেশন
Email: seeratpublication@yahoo.com

বইমেলা পরিবেশক:

পরিবেশক এবং প্রধান প্রাপ্তিস্থান
দারুন নাহদা
৩৪ বাংলাবাজার মাদ্রাসা মার্কেট (ইসলামি টাওয়ারের বিপরীত পার্শ্বে), ২য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭৩৯ ১৫২১৯৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বই কারিগর, ফোন: ০১৯৬৮ ৮৪৪৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম
বানান: সাজিদ ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য: ৩৩৪ ৳

.....

Psychology: Islami Drstikone By Dr. Aisha Hamdan, Translated By Sifat-E-Muhammad, Reviewed By Dr. Shamsul Arefin Published By Seerat Publication, Dhaka, Bangladesh.

ড. আইশা হামদান। আমার তাওফিক হয়েছে তাঁর দুটো বই বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার। অমুসলিম পরিবারে জন্মেও আল্লাহর দ্বীনকে আপন করে নিয়ে তিনি দ্বীনের পথে যে মেহনত আর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেয়। আমি মহান রবের কাছে খুব করে চাই, আল্লাহ যেন এই মহীয়সী নারীকে কবুল করেন। তাঁর কবরে ভোরের শিশিরের মতো রহমত বর্ষণ করেন। এই বইয়ের মাধ্যমে যারাই উপকৃত হবেন, সেই ভালো কাজের একটা অংশ যেন তাঁর আমলনামায় চলে যায়। আমীন।

—সাজিদ ইসলাম

সূচি

সম্পাদকের কথা ১৩
মুখবন্ধ ১৭

||প্রথম অধ্যায়||
মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

১.১ মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা ২০
১.২ মনোবিজ্ঞান ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ২৩
১.৩ মনোবিজ্ঞানের সেক্যুলার পদ্ধতির প্রধান দুর্বলতাসমূহ.....২৬
১.৪ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা..... ২৮
১.৫ জ্ঞানের উৎস.....২৯
১.৬ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২৯
১.৭ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য ৩২

||অধ্যায় দুই||
মানব প্রকৃতির স্বরূপ

২.১ আদম ও হাওয়ার ঘটনা থেকে মানব প্রকৃতি অনুধাবন ৩৫
২.২ মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ..... ৩৭
২.৩ ফিতরাত ৩৮
২.৪ ফিতরাতের প্রমাণ ৪০
২.৫ জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর ইবাদাত করা..... ৪৩
২.৬ আকিদা, ঈমান ও মনোবিজ্ঞান (পারস্পরিক সম্পর্ক).....৫১
২.৭ আল্লাহর উপর ঈমান ও ভালোবাসা ৫৩
২.৮ আখিরাতের প্রতি ঈমান.....৫৪
২.৯ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি.....৫৪
২.১০ মানব আত্মার প্রকৃতি..... ৫৬
২.১১ ভালো ও মন্দ ৫৯
২.১২ নফসের প্রকারভেদ ৬০
২.১৩ অন্তর (ক্বলব).....৬২
২.১৪ আল্লাহ অন্তরের গোপন খবর জানেন.....৬৪
২.১৫ ক্বলবের প্রকারভেদ ৬৪
২.১৬ অন্তর বিষাক্তকারী বিষয়ের বর্ণনা..... ৬৮
২.১৭ অন্তর ও আত্মায় গুনাহের প্রভাব..... ৭১

২.১৮ নফসের পরিশুদ্ধি ৭৩
২.১৯ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও জবাবদিহিতা ৭৫
২.২০ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, জবাবদিহিতা ও তাকদির ৭৭
২.২১ নিয়তের গুরুত্ব ৭৯

||অধ্যায় তিন||
ব্যক্তিত্ব

৩.১ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮২
৩.২ মুমিনের ব্যক্তিত্ব ৮৪
৩.৩ ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৫
৩.৪ ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান ৯০
৩.৫ মানবিক শক্তিমত্তার তালিকা ৯১
৩.৬ নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৯১
৩.৭ মুনাফিকের ব্যক্তিত্ব ৯৪

||অধ্যায় চার||
অন্তর ও আত্মার উপর কার্যরত বিভিন্ন শক্তি

৪.১ অন্তর ও আত্মার উপর আল্লাহর প্রভাব ৯৭
৪.২ অনুপ্রেরণা ১০৩
৪.৩ ফেরেশতাদের সহযোগিতা ১০৪
৪.৪ শয়তানের পথভ্রষ্টতা ১০৭
৪.৫ নফসের কামনা-বাসনা ও দুর্বলতাসমূহ ১০৮
৪.৬ অন্তর ও আত্মার উপর কার্যকরী শক্তিসমূহের সারকথা ১১১

||অধ্যায় পাঁচ||
মোটিভেশন (প্রেষণা)

৫.১ আধ্যাত্মিক মোটিভেশন ১১৩
৫.২ শারীরবৃত্তীয় প্রেরণা ১১৪
৫.৩ মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা/অভিপ্রায় ১১৭
৫.৪ আমলনামা ও বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ১২১
৫.৫ প্রতিযোগিতামূলক তাড়না ১২২
৫.৬ বস্তুগত তাড়না ১২৩
৫.৭ আগ্রাসী তাড়না ১২৫
৫.৮ সহযোগী তাড়না ১২৯
৫.৯ তাড়না ও অভিপ্রায় (MOTIVES) পূরণে মধ্যমপন্থা ১২৯
৫.১০ সম্পদ ও সুখের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৩০

||অধ্যায় ছয়||
আবেগ

৬.১ ভালোবাসা..... ১৩৩
৬.২ ভয় ১৩৫
৬.৩ আশা..... ১৩৭
৬.৪ ভালোবাসা, ভয় ও আশার মধ্যে ভারসাম্য..... ১৩৮
৬.৫ ঘৃণা ১৩৯
৬.৬ রাগ ১৪১
৬.৭ আবেগের সারকথা.....১৪৩

||অধ্যায় সাত||
বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও প্রজ্ঞা

৭.১ ইসলামে যুক্তির (আকল) অবস্থান ১৪৫
৭.২ জ্ঞান..... ১৪৭
৭.৩ প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা..... ১৫১
৭.৪ জ্ঞানী সম্প্রদায়.....১৫৫

||অধ্যায় আট||
শিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন (লার্নিং এন্ড মডেলিং)

৮.১ ক্লাসিক্যাল ও অপারেন্ট কন্ডিশনিং (CLASSICAL AND OPERANT CONDITIONING): ১৫৮
৮.২ আধ্যাত্মিক নমুনা প্রদর্শন (মডেলিং).....১৫৯

||অধ্যায় নয়||
জীবনের উত্থান-পতন ও পরীক্ষা

৯.১ পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টের উদ্দেশ্য.....১৬৫
৯.২ ধর্মীয় কোপিং (RELIGIOUS COPING) এর উপকারিতা..... ১৭০

||অধ্যায় দশ||
চেতনা, ঘুম এবং স্বপ্ন

১০.১ ঘুম..... ১৭৪
১০.২ ঘুমের আদবকেতা ১৭৫
১০.৩ স্বপ্ন..... ১৭৭
১০.৪ স্বপ্নের ব্যাখ্যা.....১৭৮

||অধ্যায় এগারো||
মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

১১.১ মা ও শিশুর বন্ধন এবং বুকের দুধপান করানোর গুরুত্ব..... ১৮২
১১.২ বার্ধক্য ও বয়স বৃদ্ধি ১৮৩
১১.৩ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ১৮৪

১১.৪ মৃত্যুযন্ত্রণা ও বিহ্বলতা.....১৮৫
১১.৫ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা.....১৮৬
১১.৬ মৃত্যুকালে মুমিনের আনন্দ ও কাফিরের দুঃখ.....১৮৭

||অধ্যায় বারো||
সামাজিক মনোবিজ্ঞান

১২.১ সামাজিক সমর্থনের ভূমিকা.....১৮৮
১২.২ পরিবার ও প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন).....১৯০
১২.৩ বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব.....১৯০
১২.৪ ইসলামে মাতৃত্ব.....১৯৪
১২.৫ নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা.....১৯৫
১২.৬ পরিবার কাঠামো পুনঃসংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা.....১৯৬
১২.৭ মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য.....১৯৮
১২.৮ ভালোবাসা ও ভাতৃত্ব.....১৯৯
১২.৯ মিত্রতা ও বৈরিতা (আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ).....২০১
১২.১০ তিন ধরনের মানুষ.....২০৩

||অধ্যায় তেরো||
শয়তান, জিন ও মানুষ

১৩.১ শয়তানের লক্ষ্য.....২০৯
১৩.২ শয়তানের ওয়াসওয়াসা.....২১২
১৩.৩ জাদু.....২১৩
১৩.৪ বদনজর ও হিংসা.....২১৭
১৩.৫ জিনের আছর.....২১৯
১৩.৬ শয়তানের কর্মপদ্ধতি.....২২২
১৩.৭ শয়তান ও বদ জিন থেকে সুরক্ষা.....২২৬

||অধ্যায় চৌদ্দ ||
অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান ও মানসিক অসুস্থতা

১৪.১ মানসিক অসুস্থতার সংজ্ঞায়ন.....২২৮
১৪.২ আত্মহত্যা.....২৩২
১৪.৩ মানসিক অসুস্থতার কারণসমূহ.....২৩৩
১৪.৪ ধর্মপরায়ণতা ও মানসিক সুস্থতা.....২৩৬

||অধ্যায় পনেরো||
কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি

১৫.১ সাইকোথেরাপি যেভাবে কাজ করে.....২৪০
১৫.২ ধর্মীয় সাইকোথেরাপি (RELIGIOUS OR.....২৪৩

THEOLOGICALPSYCHOTHERAPY ২৪৩
১৫.৩ মুসলিমদের সাথে ধর্মীয় সাইকোথেরাপি ২৪৫
১৫.৪ রুকইয়া..... ২৪৭

||অধ্যায় ষোল||
শান্তিময় নির্মল জীবন

১৬.১ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ২৫০
১৬.২ আল্লাহর উপর ভরসা করা ২৬৩
১৬.৩ গভীর চিন্তা ও পর্যালোচনা..... ২৬৪

||অধ্যায় সতের||
ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের উপকারিতা

১৭.১ আল্লাহর সাহায্য ২৬৭
১৭.২ আধ্যাত্মিক নূর.....২৬৮
১৭.৩ একটি সুন্দর জীবন (হায়াতে তাইয়েবা)..... ২৬৯

সারাংশ ও উপসংহার.....২৭১

||সম্পাদকের কথা||

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বান্দাকে কাজে লাগান, অযোগ্য লোককে দিয়েও বড় বড় কাজ নেন। কোনো উপায়-উপকরণ-পদ্ধতি- যোগ্যতার মুখাপেক্ষী নন তিনি। আর দরুদ ও সালাম প্রাণের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফে।

বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার সুযোগ পেলে একটা কথা পাড়ার চেষ্টা করি। সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন, যে এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফিকে বুঝে যেত যে ইনিই নবি। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া। আমাদের নবিজি (সা.) মু'জিযা বা সত্যায়ন ছিল 'কুরআন', হাদিসে এসেছে। মু'জিযা শব্দের অর্থ হলো, যা হয়রান করে দেয়, হতভম্ব করে দেয়—এতটাই যেন অবশ হয়ে যায় দেহ-মন। তাহলে কুরআন হতভম্ব করে দেবে সংশয়ীকে বা অবিশ্বাসীকে, যে সত্যকে খোঁজে এমন কাউকে। এখন আসেন, হতবাক মানুষ কখন হয়? আকস্মিকতায় আর বিস্ময়ে। এখানে মূল কারণ হবে বিস্ময়। বিস্ময় তখনই আসে যখন কোনোকিছু আমার সাধ্য, অভিজ্ঞতা বা কল্পনার সীমাকে ছাপিয়ে যায়। আমার সামর্থ্যকে যা চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমি বিস্মিত হই— বাহ! কী দারুণ। কুরআনের এই হয়রান-হতবাক করে দেয়া বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি যারা প্রথম হয়েছিল, তারা ছিল জাতিতে আরব। কাব্য ছিল তাদের রক্তে। কাব্য ছিল তাদের বিনোদন, তাদের গণমাধ্যম, তাদের ইতিহাস আর্কাইভ, তাদের মোটিভেশনাল স্পীচ। কাব্যই ছিল তাদের বংশগৌরবের বিষয়— 'অমুক কবি আমাদের বংশের'। যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, আটপৌরে জীবনের কবিতা। কুরআন এসেই তাদের কবিমানস ধরে নাড়া দিল, ছুঁড়ে দিল চ্যালেঞ্জ— সামর্থ্য থাকে তো নিয়ে এসো এর কাছাকাছি কিছু; একটা কিতাব নিয়ে আসো এমন, না পারো তো একটা সূরাহ নিয়ে এসো এমন, তাও না পারো একটা আয়াতই বানিয়ে আনো এমন।

কাবার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরাহ কাউসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবু জেহেল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরাহ কাউসার'। সূরাহ দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি

মানুষের কথা হতে পারে না'। সে তখন কাবায় গেল, নিজের কবিতা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরাহ কাউসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল: 'মা হাযা কালামুল বাশার'—এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। কাব্যে excellence অর্জনকারী ডাকসাইটে কবি হয়রান হয়ে গেল নিজের সামর্থ্যের অতীত, কল্পনাতীত ভাষার কারুকাজ দেখে। এটাই মু'জিযা।

সেই নবি তো আজও নবি, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নবি, আরবভূমি ছাপিয়ে সারা বিশ্বের জন্য নবি। তার মু'জিযা তো কিয়ামত তক মু'জিযা। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো যুগের যেকোনো জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে, তাদের excellence-কে ছাপিয়ে তাদের হয়রান করে দেবার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে কুরআনকে।

♣ এজন্যই কখনো আপনি দেখবেন এনাটমির প্রোফেসর *Tejatat Tejasen* কে বলতে—

From my study and what I have learned from this conference, I believe that everything that has been recorded in the Quran fourteen hundred years ago must be the truth, that can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is eligible [as the] creator. This creator must be God.

♣ কখনো দেখবেন ভ্রূণতত্ত্ববিদ প্রোফেসর *Keith L. Moore*-কে বলতে— the description of embryo in quran cannot be based on the scientific knowledge available in 7th century. কুরআনে ভ্রূণবিকাশের যে বর্ণনা, তা সপ্তম শতাব্দীর জ্ঞান হতে পারে না।

♣ দেখবেন সমুদ্রতত্ত্ববিদ William Hay-কে বলতে:

I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover it, the meaning of some of the passages.Well, I would think it must be the divine being.

নেট ঘাঁটলে এমন বহু সাক্ষাতকারের ভিডিও ক্লিপ আপনি পাবেন। এরা সবাই নিজ নিজ ফিল্ডে excellence অর্জন করেছেন, হয়রান হয়ে তারা ঘোষণা করেছেন— 'এটা কোনো মানুষের জ্ঞান না'। ইসলাম কবুল করুক বা না করুক, বিবেকের কাছে যে পরিষ্কার, সে স্বীকার করেছে, এবং এরা সবাই সেই আরব কবির মতো নিজ বিষয়ে পারদর্শী। আল্লাহ যাকে চাইবেন, যার মনের সন্ধানী শুদ্ধতা তাঁর পছন্দ হবে, সে বুঝে মেনে নিবে। আবার কেউ কেউ বুঝে অস্বীকার করবে, ইনিয়েবিনিয়ে ব্যাখ্যা করবে— হয়তো মুহাম্মদ বাইরে থেকে জেনেছে, হয়তো তিনি অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন, হয়তো...ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন আরবেও তারা করেছিল। কেন করেছিল? পদ, নেতৃত্ব,

সামাজিক অবস্থান, লাইফস্টাইল, পরিবার, খাহেশ পূরণে বাধার ভয়ে। এমন আজও পাবেন, মুসলিমদের ভিতরেই পাবেন, এগুলোর ভয়ে ইসলাম মানছে না।

বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞান স্রেফ 'পর্যবেক্ষণ', স্রেফ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাওয়ার বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা বেড়েছে। দূরবীন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড, রেকর্ডিং, ইসিজি, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বহুকিছু। আগে মানুষ যা দেখতে পেত না, তা দেখতে পাচ্ছে। যা শুনতে পেত না, তা ভিন্নভাবে বুঝছে। যা বুঝত না, তা বুঝে নিচ্ছে। ইসিজির গ্রাফ দেখে হার্টের ভোল্টেজ বুঝে নিচ্ছে, এক্স-রে দেখে ভিতরের হাড় দেখে নিচ্ছে, সাউন্ড দিয়ে দেখছে গর্ভের সন্তান, ডপলার দিয়ে দেখছে হার্টের ছিদ্র। মানে বিজ্ঞানের কারণে মানুষের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন বহুগুণে। ফলে যা আগে বোঝা কঠিন অসম্ভব ছিল, তা আজ চোখে দেখা যায়। আসলে তো কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়, যে এখানে বিজ্ঞানের বিষয় স্পষ্ট থাকবে। এখানেই কুরআনের মু'জিযা যে, কুরআন সে যুগের কবিদের কাছেও মু'জিযা ছিল, যদিও কুরআন কোনো কবিতার বই না। এ যুগেও বিজ্ঞানীদের কাছে কুরআন মু'জিযা, যদিও এটা বিজ্ঞানের বই না। কুরআনের উদ্দেশ্য আমাদের সতর্ক করা, কিন্তু আমাদের সতর্ককারী বিষয়ের মধ্যেই এমন মু'জিযা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের excellence–কে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের expert-দেরকে হয়রান করবে। বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের সত্যতার সম্পর্ক নেই, এসব expert-রা সবাই যোগসাজশ করে কুরআনকে 'ভুল' বললেও কুরআন ভুল হয়ে যাবে না। কিন্তু এটাও আল্লাহই করবেন, যুগে যুগে কিছু এক্সপার্টদেরকে দিয়ে তাঁর কালামের মু'জিযা প্রকাশ করে দেবেন। কিয়ামত তক করবেন। বিজ্ঞান কুরআনকে প্রমাণ করে না, জাস্ট অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ করে। মনে রাখার বিষয় এতটুকুই—বিজ্ঞানকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, তাই এটা ঈমানের ভিত্তি নয়। আমরা বিশ্বাস করি গায়েবে, বিজ্ঞানে না। তবে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ মুমিনকে তৃপ্তি দেয়, এই তৃপ্তি আল্লাহরই নিয়ামত, যেমনটি তিনি পিতা ইবরাহিম (আ.)-কে দিয়েছিলেন।

ড. আইশা উটজ হামদান আমেরিকান বংশোদ্ভূত নওমুসলিম। পেশায় ছিলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন একাডেমিক টপিককে তিনি ইসলামের নজরে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সেক্যুলার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ যে মানবসত্তা ও মনের ব্যখ্যায় এবং মনোচিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়, তা একাডেমিকভাবে তুলে ধরেছেন। মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা, প্রশান্তিময় জীবন এবং যেকোনো মানসিক ট্রমা-য় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার যে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে, এবং সেটা সেক্যুলার বিজ্ঞানও এখন এসে মেনে নিচ্ছে, কীভাবে সাইকোথেরাপিতে ধর্মীয় আচারের উপর জোর দেয়া হচ্ছে—সে বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। তবে প্রচলিত বিজ্ঞানের সাথে তুলনা এই বইয়ের মূল উপজীব্যও নয়, মূল সার্থকতাও নয়। লেখিকার মূল সার্থকতা হলো: তিনি এখানে মনোবিজ্ঞানের ইসলামি বয়ান হাজির করতে পেরেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে।

একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের স্বতন্ত্র ভিউপয়েন্ট রয়েছে সব ব্যাপারেই। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় মানুষকে কেবল সামাজিক জীব মনে করা হয়। ইসলাম মানুষকে বলছে আধ্যাত্মিক জীব। যার আধ্যাত্ম শক্তি যত মজবুত, সে তত ভালো মানুষ। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করবে। ইসলাম মানবতা, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাখ্যা দেয়। এবং এমন একটা জীবন কাঠামোর কথা বলে, যা মানবসত্তার 'ভাল থাকা'র নিশ্চয়তা দেয়। ধর্মীয় আচার, অন্তরের চর্চা, বিশ্বাস, আন্তঃসম্পর্ক, আত্মনিয়ন্ত্রণ—সবকিছুর সমন্বয়ে ইসলাম এমন এক জীবনের কথা বলে যা অর্থপূর্ণ, স্বচ্ছন্দ, এবং মানবসত্তার মনোদৈহিক সহজাত স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্যই মানুষের মন, মনের নানান অংশ, মনের নানান মিথষ্ক্রিয়া, ভাঙা মন, মন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় ইসলাম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, কেননা পরকালের কনসেপ্টটাই মনের সাথে জড়িত। ইসলাম এমন একটা ব্যবস্থা যা পরকালের সাথে সাথে ইহকালীন কল্যাণের উপরেও জোর দেয়, এবং ইহকালের সাথে পরকালের সম্পর্ক নির্দেশ করে। এভাবে মানুষের সহজাত স্বভাবের অনুকূল এক জীবনাচার ইসলাম নিরূপণ করে দেয়, যা নিশ্চিত করে মানবসত্তার 'ভালো থাকা'। মন, মনোবিজ্ঞান ও মনোচিকিৎসার ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত উঠে এসেছে একাডেমিক ধাঁচে।

তবে যারা আমরা একাডেমিক নই, আমাদের প্রত্যেকের বইটি পড়া দরকার। এই জন্য যে, নিজের মনকে চেনা আর সবকিছু চেনার চেয়ে বেশি দাবি রাখে। পুরো একটা জীবন কেটে যায় নিজেকে জানা হয় না। সবার জন্য সময় বের করা যায়, নিজের জন্য সময় বের হয় না। আমার মন কী, কী চায়, মনের কী কী জিনিস প্রশ্রয় দেব, কী কী নিয়ন্ত্রণ করব, ভাঙা মন কীভাবে সামলাব, কেন 'আমি ভালো নেই' অনুভূতি হয়, উত্থানপতনে মনকে কীভাবে সামলাতে হয়—এগুলো তো জীবনের সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা হওয়া উচিত। একেকটা পাবলিক পরীক্ষার পর আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যাচ্ছে, কী শিক্ষা দিচ্ছি আমরা আমাদের বাচ্চাদের? বাবা-মা হিসেবে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ। এজন্য প্রত্যেকের বইটা পড়া উচিত নিজের মনের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য। আমার মনের স্বভাব জানলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আমার জন্য সহজ। মনের হাতে নিজের নাটাই তুলে না দিয়ে আমার হাতে আমার মনের নাটাই থাকবে, এটাই কাম্য।

'মানসাঙ্ক' লেখার সময় মনোবিজ্ঞানের অনার্স লেভেলের বেশকিছু বই পড়তে হয়েছিল। মেডিক্যালে এমবিবিএস কোর্সে সাইকিয়াট্রিও কিছু পড়তে হয় আমাদের। সেই বিদ্যাটুকু কাজে লেগে গেল এখানে। সকলকে পড়ার আহ্বান। চর্চা করার আহ্বান। ইহকাল ও পরকালে ভালো থাকাই হোক আমাদের জীবনদর্শন।

ডা. শামসুল আরেফীন
চিকিৎসক, লেখক

||মুখবন্ধ||

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে হিদায়াত চাই। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফসের অনিষ্ট হতে এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট হতে। যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি শরিক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মদ (সা.)তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশের সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি বিভাগে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পরবর্তীতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও আমি কোনো সন্তোষজনক সাইকোলজিক্যাল থিওরি খুঁজে পাইনি যা বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে মানব মনের প্রকৃতি ব্যাখা করতে পেরেছে। যদিও বিভিন্ন সেক্যুলার সাইকোলজিস্টদের প্রায় ২৫০ এর অধিক তত্ত্ব আমি অধ্যয়ন করেছি, এর একটিও আমাকে মানব মনের সঠিক ব্যাখা প্রদান করতে পারেনি। কিছু থিওরিকে অন্য থিওরির থেকে অধিক আকর্ষণীয় মনে হলেও, সব সময় মনে হতো কী যেন নেই, কী যেন নেই। খণ্ড খণ্ড টুকরোগুলো মিলে একত্রে যেন কোনো ছবি তৈরি করতে পারেনি।

ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের পর আমি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য খুঁজতে শুরু করলাম। (যদিও পিএইচডি অর্জনের বহু আগেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি)। শুরুতে এই অনুসন্ধান কিছুটা কঠিন ছিল। কেননা, বিভিন্ন ভ্রান্ত সুফিবাদী মতামত ও দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে বিশুদ্ধ ইসলামি সাইকোলজিকে পৃথক করতে হয়েছে। অবশেষে আমি আল্লাহর অনুগ্রহে ইংরেজি ভাষাতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিশুদ্ধ উৎসের সন্ধান পাই। আমি সেগুলো পড়তে শুরু করি এবং যতই পড়েছি ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে সত্যটা। আমি অবাক হয়ে দেখেছি ইসলামি পদ্ধতি কত জটিলতামুক্ত! সবশেষে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমি যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করছিলাম তা মিলেছে ইসলামের মধ্যেই । ইসলাম সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ চিত্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সোজাসাপ্টা ব্যাখা প্রদান করে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের গুরুত্ব কিংবা জীবনে কোনো বিষয়গুলো প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইত্যাদি সবকিছু ইসলামে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিভাবে আমরা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, কিভাবে শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারি

ইত্যাদি ধাপগুলোর আলোচনা ইসলামে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব। এই পথে দৃঢ়পদ থাকা সহজ না হতে পারে, তবে লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নিশ্চিতভাবেই।

যখন আমি জানলাম যে আমরা সবকিছুতে নিছক আমাদের জেনেটিক গঠনের ভিকটিম নই কিংবা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান পরিবেশ দ্বারা সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নই, তখন আমার মনে শান্তির সুবাতাস বয়ে গেল। কিছু ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। সেই স্বাধীন সিদ্ধান্তের অর্থ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং রব আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা। এবং এই আত্মসমর্পণ হতে হবে তাঁরই দেখানো পথনির্দেশ মোতাবেক। এই পথই হলো একমাত্র পথ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের সুখ-শান্তি দিতে পারে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা যেন এক নিরাপদ অভয়ারণ্যে প্রবেশ করি। যা আমাদের নিরাপত্তা দেয় জীবনের নানাবিধ চড়াই-উতরাই, পরীক্ষা, বাধা-বিপত্তি, মানসিক চাপ এবং প্রবৃত্তির হীন কামনাবাসনা থেকে।

আমি মূলতঃ আগ্রহ পেয়েছি এতদিন নানান সেক্যুলার তত্ত্ব প্রচারকারী পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা থেকে। তাদের করা রিসার্চগুলোই এখন মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করছে। ধার্মিক ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের উপর ধর্মের যে গভীর প্রভাব রয়েছে, আধুনিক গবেষণার ইশারা এখন সেদিকেই। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যতই আগ্রহী হচ্ছেন, ততই আরো বেশি প্রমাণ মিলছে। বিভিন্ন আবেগিক, মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা নিরাময় ও প্রতিরোধে ধার্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত উপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। এসকল গবেষণা বাস্তবিকই নির্দেশ করছে ইসলামের সত্যতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১ : ৫৩)[১]

[১] কুরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত 'আকুরআনুল করীম-' থেকে।

||প্রথম অধ্যায়||
মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

> ‘আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।’ (সূরাহ যুমার, ৩৯;৪১)

একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত নমুনা (মডেল) উপস্থাপন করেছে। আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, আবেগিক, সামাজিক তথা সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের শিক্ষা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, মজ্জাগতভাবে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। ফলে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর সাথে আমাদের একটি সংযোগ বজায় রাখতে হয়, সেটার পরিচর্যা নিতে হয়। সুখ-শান্তি হচ্ছে এমন দুটি চির ছলনাময়ী উপাদান, যা অর্জনের চেষ্টা মানুষ চালায় তার সত্তার সূচনা থেকেই । আর সেই অন্তরের সুখ-শান্তি ধরা দেয় আল্লাহর সাথে আমাদের সংযুক্ত থাকার মাধ্যমেই । আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ, ইচ্ছা ও আচার-আচরণের উদ্দেশ্য অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক সুস্থতা ও ‘ভালো থাকা’র সূত্র হলো মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর আদেশের প্রতি অনুগত থেকে সদাসর্বদা আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখা।

এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মনোবিজ্ঞান, মানসিক সুস্থতা ও ‘ভালো থাকা’র উপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা। আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে নানা দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং গবেষক মানবসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে হয়রান হয়েছেন। অথচ মানবসত্তার সবচেয়ে নিখুঁত, বিস্তারিত এবং সার্বিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া ছিল কুরআন ও হাদিসে। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্কে আমাদের থেকেও ভালো জানেন। যে জ্ঞান অব্দি আমরা কখনোই পৌঁছতে পারব না, তাও তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তে। কাজেই, আমাদের রব ওহীর মাধ্যমে যা কিছু তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে প্রকাশ করেছেন, তার মাধ্যমেই মানব প্রকৃতির স্বরুপ বুঝতে হবে।

ধর্মীয় ভিত্তিকে এড়িয়ে যাবার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেক্যুলার সাইকোলজিস্টদের গবেষণাগুলো ইসলামের সত্যতাকেই সমর্থন করে। এই মর্মে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করা অত্র বইয়ের **আরেকটি উদ্দেশ্য।** উল্লেখ্য, ইসলাম

বৈজ্ঞানিক সত্যায়নের মুখাপেক্ষী নয়, কেননা কুরআন নিজেই সত্যতার সবচেয়ে বড় দলিল। অথচ বর্তমান যুগে লোকেরা বিজ্ঞানকে ওহীর উপর প্রাধান্য দেয়। ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিপরীতে ইসলামে আবিষ্কৃত বিষয়াদির বাস্তবতা উপস্থাপন করাও জরুরি। একজন অহংকারী ব্যক্তিও বিনীত হতে বাধ্য হয়, যখন সে দেখে সারাজীবন যে তত্ত্ব 'প্রমাণ' করার চেষ্টায় সে ক্লান্ত, সেটি কিনা চৌদ্দশ বছর আগেই কুরআনের আয়াত ও রাসূলের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে!

নিজেকে বদলানোর (সেলফ ট্রান্সফর্মেশন) যোগ্যতা প্রত্যেকটা মানুষকে কিভাবে ইসলাম প্রদান করেছে, সেটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই বইয়ের **আরেকটি সম্পূরক উদ্দেশ্য।** দুনিয়াতে এমন কোনো 'সেলফ হেল্প' বই নেই, যা ইসলামের কালোত্তীর্ণ শিক্ষার সমান্তরালে দাঁড়াতে পারে! যে শিক্ষা আপনাকে বদলে দেবেই দেবে।

ইসলামের অসাধারণ সম্ভাবনা ও সক্ষমতা অনুধাবনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের গড়া প্রথম মুসলিম সমাজের ঘটনাবলীতে চোখ বুলানোই যথেষ্ট। ইসলামের অসাধারণ রূপান্তরী শক্তিতে জাহেলী আরব সমাজ পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। জুলুম, প্রতারণা, লোভ-লালসা ও অহংকারে নিমজ্জিত সেই সমাজ এমন এক সমাজে পরিণত হলো যেখানে ছিল কেবলই ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিনয়। ইসলামের অনুরূপ অর্জন আর কোনো জীবনব্যবস্থা করতে পেরেছে? পুরো মানব ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় নজির পাওয়া যায় না।

মনোবিজ্ঞানের বিস্তারিত আলোচনা করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, তবে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো এখানে আলোচনায় চলে এসেছে, যেমন- *মনোবিজ্ঞানের সাধারণ পরিচিতি; মানব মনের স্বরূপ; ব্যক্তিত্ব; আত্মার উপর কার্যকরী শক্তিসমূহ; মোটিভেশন (প্রেষণা); আবেগ; বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও প্রজ্ঞা; 'লার্নিং এন্ড মডেলিং' (শিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন); জীবনের বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষাসমূহ; সচেতনতা, ঘুম ও স্বপ্ন, 'লাইফস্প্যান ডেভেলপমেন্ট' (বয়স বৃদ্ধি ও বার্ধক্য); সামাজিক মনস্তত্ত্ব; শয়তান, জিন ও মানুষ; অস্বাভাবিক মনস্তত্ব ও মানসিক অসুস্থতা; কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি; শান্তিময় নির্মল জীবন, ইবাদতের উপকারিতা* ইত্যাদি।

১.১ মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে রচিত সাইকোলজির যেকোনো পরিচিতিমূলক টেক্সট বইতে আপনি দেখতে পাবেন, মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞাটি অনেকটা এরকম :

> The scientific study of **behavior** and **mental processes;** behavior is considered to be anything that an individual does or any action that can be observed by others. mental processes are the internal, subjective, unobservable components, such as thoughts, beliefs,

feelings, Sensations, perceptions Etc., that can be inferred from Behavior.[১]

আচার-আচরণ ও **মানসিক কার্যপ্রণালীর** বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে মনোবিজ্ঞান বলে। আচরণ হলো কোনো ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য কাজ যা অন্যরা দেখতে পায়। আর মানসিক কার্যপ্রণালী দেখা যায়না, অপর্যবেক্ষণযোগ্য; এগুলো আভ্যন্তরীণ, আপেক্ষিক ও অদৃশ্য উপাদানসমূহের সমষ্টি। যেমন- চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, উপলব্ধি ইত্যাদি। আচরণ হতে মানসিক কার্যপ্রণালী অনুমান করা যায়।

বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র হিসেবে মনোবিজ্ঞানে যেসব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে: আমরা কারা? আমাদের মৌলিক প্রকৃতি কিরূপ? আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ ও আচার-আচরণে উৎস কি? কিভাবে আমরা নিজেরাই সেসব উৎস পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইত্যাদি। নানাবিধ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে। সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, মানুষের আচরণ, মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া ও আবেগ-অনুভূতিকে বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং পূর্বানুমান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

আপাতদৃষ্টিতে তাদের এই প্রচেষ্টা মূল্যবান, সার্থক ও সমাজের জন্য উপকারী বলেই মনে হয়। কিন্তু নিবিড় নিরীক্ষণে (বিশেষত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) এর নানাবিধ ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে পড়ে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো, মানবসত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আত্মাকে(soul) উপেক্ষা করা। এক্ষেত্রে বর্তমানে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হলেও মানুষের অস্তিত্বের জৈবিক, আচরণগত ও সামাজিক দিকগুলো সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানে খুব কমই আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে মানব প্রকৃতির সার্বিক ও পরিপূর্ণ তত্ত্ব প্রদানে এখনো বেশ ঘাটতি রয়ে গেছে। এছাড়া ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও 'ভালো থাকা'র পক্ষে কার্যকরী ও টেকসই পদ্ধতি বাতলানোতেও রয়ে গেছে কমতি।

মজার ব্যাপার হলো, 'সাইকোলজি' শব্দটি বুৎপত্তিগত অর্থেই আত্মা বা রূহ (soul or spirit) সম্পর্কিত অধ্যয়নকে বুঝিয়ে থাকে। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর পৃথক হওয়ার আগে রূহ বা আত্মার আলোচনা মনোবিজ্ঞানের একটি বড় স্থান দখল করত। এমনকি আধুনিক সময়েও অনেক পেশাদার মনোবিজ্ঞানী রয়েছেন যারা সেই বিশ্বাসগুলো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তারা মূলত ইহুদি-খ্রিস্টান পটভূমি থেকে এসেছেন, যদিও তাদের সংখ্যা (অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের তুলনায়) খুবই অল্প। ফলে, মনোবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলো রয়ে গেছে সেক্যুলার প্রকৃতিরই।

[১] Myers, D.G., 2007, Psychology (8th ed.), New York: Worth Publishers, p. 2.

বাস্তবে মনোবিজ্ঞানীরা কম ধর্মপরায়ণ হন সাধারণ মানুষের চেয়ে। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে নিম্নের তথ্য উঠে এসেছে:

ক্রম	সূচক	সাধারণ মানুষ	মনোবিজ্ঞানী
১	নিজেকে কোনো ধর্মের অনুসারী দাবী করেন না	৬%	১৬%
২	জীবনে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না	১৫%	৪৮%
৩	নাস্তিকতা অনুসরণ করেন	৫%	২৫%
৪	'আমার জীবনের গতিপথ ধর্মের উপর নির্ভরশীল'	৭২% হ্যাঁ বলেছেন	৩৫% হ্যাঁ বলেছেন
৫	আল্লাহকে (গড) বিশ্বাস করেন?	৯৫% হ্যাঁ বলেছেন	৬৬% হ্যাঁ বলেছেন

অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাধারণ মানুষ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে,
১। শতকরা প্রায় দ্বিগুণের বেশি মনোবিজ্ঞানী (যথাক্রমে ৬% বনাম ১৬%) নিজেকে কোনো ধর্মের অনুসারী দাবি করেন না।
২। জীবনে ধর্মের ভূমিকা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য তিনগুণের অধিক (১৫% বনাম ৪৮%),
৩। আর নাস্তিকতা অনুসরণের ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের তুলনায় মনোবিজ্ঞানীদের শতকরা হার পাঁচগুণ বেশি (৫% বনাম ২৫%)।
৪। নিয়মিত প্রার্থনা করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া কিংবা ধর্মীয় কাজে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষদের থেকে সাইকোলজিস্টরা পিছিয়ে।[২]
৫। 'আমার জীবনের গতিপথ ধর্মের উপর নির্ভরশীল'এই বক্তব্যের সাথে ৩৫% মনোবিজ্ঞানী একমত হয়েছেন অথচ সাধারণ মানুষদের মধ্যে ৭২% একমত হয়েছেন।
৬। আল্লাহ (তাদের ভাষ্যমতে 'গড') বিশ্বাস করেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ৬৬% মনোবিজ্ঞানী এবং ৯৫ % সাধারণ মানুষ হ্যাঁ বলেছেন।

গবেষকরা (গবেষণাপত্রটি যারা লিখেছে) এই পরিসমাপ্তিতে পৌঁছেছেন যে, সাইকোলজিস্টরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক কম ধর্মপরায়ণ, যদিও জরিপে অংশগ্রহণকারীরা (ধর্মের বদলে) আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এবং এক্ষেত্রে তারা আধ্যাত্মিকতাকে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় বলে ইঙ্গিত করেছেন; যার সংজ্ঞা এতই

[২] Delaney, H.D., Miller, W.R & Bisono, A.M., 2007, Religiosity and spirituality among psychologists: A survey of clinician members of the American Psychological Association, Professional Psychology: Research and Practice, 38(5), p.542.

হালকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মও এর জন্য খুব একটা জরুরি না। এ কারণে কিছু মানুষ নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক বলে মানলেও ধার্মিক মানতে চান না, তারা বলেন, **'আমরা আধ্যাত্মিক তবে ধার্মিক নই!'**[৩]

১.২ মনোবিজ্ঞান ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস

সেক্যুলার সংজ্ঞানুসারে ধারণা করা হয়, আমাদেরকে দুনিয়াতে নিজের খেয়াল-খুশীমত চলার স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 'ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ' বা জবাবদিহিতার কোনো বালাই নেই। এই মতে ধরে নেয়া হয়, আমাদের জীবনে আল্লাহর কোনো প্রভাব নেই। এমনকি অনেকে এটাও অস্বীকার করেন যে, কোনো উচ্চতর সত্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে সেক্যুলার ধারণায় আমরা নিছক একটি দৈহিক সত্তার সাথে সংযুক্ত কিছু আবেগ, চিন্তা ও আচরণের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নই। মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ বলে ধরে নেয়া হয়।

অধিকাংশ আচরণবিদ (Behavioural scientists) বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদকে (সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজম) স্বতঃসিদ্ধ মনে করে তাদের তত্ত্ব ও গবেষণাসমূহ দাঁড় করিয়েছেন। এই দর্শন অনুসারে বলা হয়:

'মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, এখানে কোনো অতিপ্রাকৃত প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। আর সকল সম্ভাব্যতা অনুসারে, বিজ্ঞান এই বিশ্বজগতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেটাই বাস্তবতার একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।'[৪]

এই মতে ধরে নেয়া হয়, কোনো ঐশ্বরিক প্রভাব বা আল্লাহর (God) দিকে প্রত্যর্পণ ব্যতীতই মানব সত্তা ও মহাবিশ্বকে অনুধাবন ও ব্যাখা করা যায়।[৫]

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের শেকড় প্রোথিত 'দৃষ্টবাদ' ও 'অভিজ্ঞতাবাদ' নামক দুটি মতবাদের উপর।

দৃষ্টবাদ (positivism) অনুসারে, 'দৃশ্যমান ঘটনাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফলে একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করা যায়।'[৬] এভাবে দলীলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টবাদ (positivism): অগাস্ট কোঁৎ তার 'Course de Positive Philosophy' গ্রন্থে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'দৃষ্টবাদ' অন্যতম। অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের ধারাকে

[৩] Ibid, p 542.।(S.B.N.R = spiritual but not religious)

[৪] Honer, S.M., and Hunt, T.C., 1987, Invitation to Philosophy: Issues and Options (5th ed.) Belmont, CA: Wadsworth, p.225.

[৫] Richards, P.S., 2005, Theistic psychotherapy, Psychology of Religion Newsletter 31(1), p.1.

[৬] Honer and Hunt, 1987, p.226.

তত্ত্বসমূহকে প্রমাণ করা হয় এবং সেগুলো বাস্তবতার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৭]

অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) একটি তুলনামূলক বা আপেক্ষিক ধারণা; এই মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে জ্ঞানের চূড়ান্ত এবং প্রকৃত উৎস হল অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা লব্ধ যুক্তি।[৮] সহজ কথায় যদি কোনো কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লব্ধ না হয় তাহলে সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে এটি সুস্পষ্ট যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যতটুকু স্বীকার করেন বাস্তবতা তার চেয়েও অনেক জটিল। গায়েব বা অদৃশ্য জগৎকে মানবিক বোধশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না; গায়েবের জগত দৃশ্যমান জগত অপেক্ষা ব্যাপক। উপরন্তু দৃশ্যমান জগতে অদৃশ্য জগতের নানা মিথস্ক্রিয়া ও প্রভাব বিদ্যমান।

তিনটি স্তরে ভাগ করেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের বিকাশের তৃতীয় বা চূড়ান্ত যুগ হচ্ছে পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রকৃতির বাইরে ঈশ্বর বা অন্য কোনো চরম সত্তাকে অস্বীকার করা হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা এবং দৃশ্যমান প্রকৃতিই এখানে চরম সত্য এবং একে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। কোঁতের দৃষ্টবাদের মূলকথা হচ্ছে, এ স্তরে বিজ্ঞান শুধু বাস্তব জগতের দৃষ্ট দৃশ্যমান বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবে এবং এর বাইরে অন্য কিছু অনুসন্ধান করবে না।

অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism): সাধারণত অভিজ্ঞতাবাদ বলতে এরূপ তত্ত্বকে বোঝায় যেখানে মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস গণ্য করা হয়। (অনুবাদক)

আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে একটি আত্মা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদের আত্মা ও দেহ, এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। এই বিষয়টি কুরআনে বারবার উল্লেখ হয়েছে। এবং এটাই আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভূত্বে (লর্ডশিপ) বিশ্বাসের ভিত্তি। আল্লাহ বলেছেন,

> ‘আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরাহ যুমার, ৩৯;৬২-৬৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

[৭] Richards, P.S., and Bergin, A.E., 2005, A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy (2nd ed.), Washington, DC: American Psychological Association, pp. 33-34.
[৮] Honer and Hunt, 1987, p.220; Richards and Bergin, 2005, p.34.

'পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১)

- অন্যত্র বলেছেন,

'বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না?' (সূরাহ মুমিনুন,২৩: ৮৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরাহ সাফফাত, ৩৭:৯৬)

এই আয়াতসমূহে **বিশ্বজগতের সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও রাজত্ব** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নির্দেশিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই মহাবিশ্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং মনিব, কর্তা ও প্রভূ (রব)। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, রিজিক প্রদান করেন, জীবন-মৃত্যু ঘটান, এবং কবর থেকে আমাদের পুনুরুত্থিত করবেন। কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তিনি প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর এই নিয়ন্ত্রণ জেনেটিক্স (জিনতত্ত্ববিদ্যা), অভিজ্ঞতা, চিন্তা, আবেগ ও আচার-আচরণের উপরেও বিস্তৃত।

মানুষ হিসেবে আমাদের কোনো কিছু বেছে নেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। আমরাও কিছু কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু এটা আল্লাহর রাজত্বের বিপরীতে মোটেও তুলনীয় নয়। বস্তুত বিভিন্ন ঘটনার উপর মানবিক প্রভাবশক্তি খুবই সীমিত। মূলত মানুষ কেবল তার সামনে থাকা 'অপশন' থেকেই কোনো একটিকে বেছে নিতে পারে। তবে মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি বা বাছাই থেকেও চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন তরুণ সিদ্ধান্ত নিল যে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। এরপর সে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করল এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেক উৎসাহিত বোধ করল। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তাআলা ছেলেটির তাকদীরে ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন নির্ধারণ করে থাকেন, কেবলমাত্র তখনই সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু যদি সেটা তাকদীরে লিপিবদ্ধ না থাকে তাহলে সে কখনো সুযোগ পাবে না। এ কারণে মুসলিমরা ভবিষ্যতের ঘটনার ব্যাপারে বলেন, 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন)! সূরাহ কাহাফে আল্লাহ বলেছেন,

'আপনি কোনো কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে ...'(সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৩-২৪)

সুতরাং, তাকদির ও আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানার মাধ্যমে আপনি যেভাবে মানবসত্তার স্বরূপ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, ঠিক তেমনিভাবে দৈনন্দিন নানাবিধ কার্যক্রমেও অনেক নির্ভার থাকবেন।

একমাত্র আল্লাহই আমাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে সক্ষম, এই বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন কার্যক্রমের অনেক **মর্মপীড়া থেকে মুক্তি** পাই। সেই 'কাঙ্খিত' চাকরি